বাংলাদেশের ড্রোন সাফল্য এবং আইএফডি'র প্রস্তাবনা

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল ৭

ফেব্রুয়ারী ৫, ২০১৪

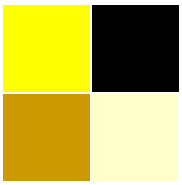

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

বাংলাদেশের ড্রোন সাফল্য এবং আইএফডি'র প্রস্তাবনা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অত্যাধুনিক ড্রোন তৈরির বেশ কয়েকটি সংবাদ মিডিয়াতে প্রচারিত হয়েছে। এই ড্রোনগুলি তৈরি করেছে বাংলাদেশের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনাময় তরুণ বিজ্ঞানীরা। আইএফডি যেহেতু একটি ভার্চুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক এবং যেহেতু গবেষণা এবং নতুন উদ্ভাবন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা নিয়েই আমাদের মূল কাজ, সেহেতু দেশের তরুণ মেধাবীদের এই সাফল্যে আমরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে পারছি না। আজকের স্পেশাল আর্টিকেল আমাদের এই প্রতিক্রিয়ারই ফসল।

বাংলাদেশে যে ড্রোন তৈরি হচ্ছে, তা আমরা প্রথম জানতে পারি জানুয়ারি মাসের শুরুতে। দেশের একটি পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে প্রচারিত হয় শাহজালাল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী একটি ড্রোন তৈরি করার কাজে হাত দিয়েছে এবং আগামী এপ্রিল মাসেই তা পরীক্ষামূলকভাবে আকাশে উড়ানো হবে।

তার কিছুদিন পরই অপর একটি পত্রিকার রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি, দেশের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান একটি ড্রোন তৈরি করেছে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরে তার পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন করানো হয়েছে। এই সংক্রান্ত সংবাদ খুঁজতে গিয়ে আমরা আরো জানতে পারি যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী ড্রোন জাতীয় একটি কপ্টার তৈরি করেছিল ২০১৩ সালে। পরবর্তীতে সে আরো গবেষণা করে এই ড্রোনে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করে।

একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং কাছাকাছি সময়ে সফলতা অর্জন করেছেন – এই ধরনের নজির বিশ্বের ইতিহাসে অনেক রয়েছে। তাই বাংলাদেশের মত দেশে একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি ড্রোন গবেষণা করেছেন এবং তার সফল পরীক্ষা চালিয়েছেন – তাতে আমরা অবাক হইনি। বরং আনন্দিত হয়েছি।

এই সফল পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হল দেশে তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের কোন অভাব নেই। অভাব রয়েছে শুধু পৃষ্ঠপোষকতার। সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা পেলে এই তরুণ মেধাবীরাই একদিন দেশ এবং জাতিকে বদলে দেবে।

তরুণ মেধাবীরা কারা?

আমাদের যে সকল পাঠক ড্রোন তৈরির এই সাফল্যের বিস্তারিত এখনো জানেন না, তাদের জ্ঞাতার্থে আমরা এই তরুণ বিজ্ঞানীদের কিছু তথ্য শেয়ার করছি যা মূলত আমরা যোগাড় করেছি বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার অনলাইন সংস্করণ থেকে।

বাংলাদেশের ড্রোন তৈরির পথিকৃৎ হলেন খুলনা প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র আব্দুল্লাহ আল মামুন খান দীপ। তিনি তার ৪র্থ বর্ষের থিসিসের আওতায় একটি ড্রোন জাতীয় কপ্টার তৈরি করেন যা পরীক্ষামূলকভাবে আকাশে ওড়ান ২০১৩ সালের জুলাই মাসে[১]।

এই ড্রোন তৈরি করতে গিয়ে তিনি তার বন্ধু রিজভি আহমেদ এবং সহপাঠী গোলাম সুলতান মাহমুদ রানার কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন। তার এই থিসিস প্রজেক্টের সুপারভাইজার ছিলেন তড়িৎ ও ইলেকট্রোনিক কৌশল বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. শাহজাহান।

দীপের তৈরি করা এই ড্রোন কোন প্রকার রিমোট ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে উড়তে সক্ষম। একে গুগল ম্যাপে সুনির্দিষ্ট লোকেশন বলে দিলেই ড্রোনটি তার পথ পরিভ্রমণ করে তার আগের জায়গায় ফিরে আসবে। এই ড্রোনটি পণ্য পরিবহনে এবং প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এই ড্রোনের নির্মাতা দীপ ২০১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় রোবোটিক কম্পিটিশন "ইন্টারন্যাশনাল অটোনমাস রোবোটিক কম্পিটিশন"

[১] সম্প্রতি দি ডেইলি স্টারে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কাওসার জাহান এবং নাজিয়া আহসান এই ধাচের একটি ড্রোন তৈরি করেছিলেন ২০১২ সালে। তারা তাদের মডেলটি প্রদর্শন করেছিলেন ডিজিটাল এক্সপো ২০১২ প্রদর্শনীতে। তবে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারী এবং ততক্ষণে আমাদের আর্টিকেলটি প্রস্তুত হয়ে যাওয়াতে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারছি না বলে দুঃখিত। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করার আশা রাখি।

এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। সেই প্রতিযোগিতায় তার সঙ্গে ছিলেন তার সহপাঠী গোলাম সুলতান মাহমুদ রানা।

নিজের তৈরি করা ড্রোনের সামনে উদ্ভাবক আব্দুল্লাহ আল মামুন খান দীপ[২]

দীপের তৈরি করা ড্রোনের ভিডিও দেখতে হলে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুনঃ

http://www.youtube.com/watch?v=oOIKZVz17I0
http://www.youtube.com/watch?v=z8zwMfXrJPs
http://www.youtube.com/watch?v=9Z3V1PA0etk

[২] ছবিসূত্রঃ www.eduicon.com

দীপের পর যে দলটি ড্রোন তৈরিতে সফলতা অর্জন করে, তাদের নের্তৃত্ব দেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র সৈয়দ রেজওয়ানুল হক নাবিল। তার দলের অন্য সদস্যরা হলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র রবি কর্মকার, এবং একই বিভাগের মারুফ হোসেন রাহাত। তাদের এই প্রজেক্টের তত্বাবধানে আছেন খ্যাতিমান কম্পিউটার বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

এই ড্রোন তৈরিতে তারা বাইরের কোন অর্থ সাহায্য পাননি। এই পুরো গবেষণাটা তারা করেছেন নিজের টাকাতেই। তবে তারা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে স্পন্সর পেলে তারা এই ড্রোনটিকে আরো বেশি উন্নত করতে পারবেন।

এই ড্রোনটি ব্যবহার করা যাবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে, আবহাওয়ার তথ্য আদান প্রদানে, এবং উপর থেকে ছবি তোলার কাজে।

শাবিপ্রবি'র শিক্ষার্থীদের তৈরি করা ড্রোনের ভিডিও দেখতে হলে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুনঃ

http://www.youtube.com/watch?v=4WgDKJAaQGY

ইতোমধ্যে এ্যারো রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য দুটি ড্রোনের সফল পরীক্ষা চালায়। তাদের ড্রোনগুলির নাম ঘুড়ি ১ এবং বাংলাড্রোন। এর মধ্যে ঘুড়ি ১ প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চতায় ২৫ মিনিট ধরে উড়তে সক্ষম এবং এর সর্ব্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৪০ কি.মি.। এর ওজন ৭.৬ কেজি এবং এটি প্রায় ১০ কেজি ওজন বহনে সক্ষম। অন্যদিকে বাংলাড্রোনের ওজন অনেক কম, মাত্র ১.৬ কেজি। এবং এটি ১ কেজি ওজন বহনে সক্ষম। এখানে উল্লেখ্য, মি. আব্দুল্লাহ আল মামুন খান দীপ বর্তমানে এ্যারো রিসার্চ সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের আকাশে গতকাল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে ওড়ানো হলো ড্রোনের একটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ ● ছবি : প্রথম আলো

আমরা আইএফডি'র পক্ষ থেকে এই সকল তরুণ বিজ্ঞানীদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদেরকে যারা নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা তাদের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত বোধ করছি এবং আমরা মনে করি তাদের এই সাফল্য ভবিষ্যতে তরুণ মেধাবীদের নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে।

তবে আমাদের প্রশ্ন হল, তরুণরা কি শুধুই এক বা একাধিক ড্রোনের সফল পরীক্ষা চালিয়েই তাদের কার্যক্রম শেষ করে দেবেন? তারা যদি ভবিষ্যতে তাদের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারি বা বেসরকারি কোন সহযোগিতা না পান, তাহলে তারা কি তাদের গবেষণা বন্ধ করে দেবেন?

নিজেদের টাকায় এই ধরনের গবেষণা কত দুর করা সম্ভব? আর নিজেদের টাকা যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে টাকা আসবে কোথা থেকে?

আমরা নিচের সেকশনগুলোতে এই প্রশ্নগুলিরই একটি গ্রহণযোগ্য উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

আমরা এখন কল্পনা করছি এই ড্রোন গবেষণার ভবিষ্যৎ কি?

ধরা যাক, মি. আব্দুলাহ আল মামুন দীপ এবং মি. সৈয়দ রেজওয়ানুল হক নাবিল এর নের্তৃত্বাধীন দুটি দলেরই সুযোগ হল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামনে তাদের মডেলটি উপস্থাপন করার।

তারা তাদের মডেল সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে পরীক্ষা করে দেখালেন। সেই পরীক্ষায় ধরা পড়ল, সেনাবাহিনী ড্রোনের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য চাচ্ছে, সেই সকল বৈশিষ্ট্য এই ড্রোনগুলিতে আনতে হলে আরো উৎকর্ষতা প্রয়োজন। প্রয়োজন আরো গবেষণার।

এই নতুন গবেষণার জন্য আবার প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। এখন এই নতুন প্রয়োজনীয় অর্থ কে দেবে? বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কি এই ধরনের অর্থ বরাদ্দের কোন ফান্ড আছে?

আবার অর্থ থাকলেও সেনাবাহিনী যে এই অর্থ বরাদ্দে রাজি হবে, সেটাও তো ১০০% ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। কারণ এই ধরনের গবেষণায় তো প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জানেন না এই নতুন অর্থ বরাদ্দ দেয়ার পরও তারা এমন একটি ড্রোন পাবেন কিনা যা কিনা তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

তাই এই সকল চিন্তাভাবনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এই গবেষণায় তারা কোন নতুন অর্থ খরচ করবেন না। বরং বিদেশে যে সকল ড্রোন ইতোমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছে এবং যেগুলি ইতোমধ্যেই পরীক্ষিত, তারা প্রয়োজনে সেগুলি আমদানি করে ফেলবেন।

এই যদি হয় বাস্তব পরিস্থিতি, তাহলে তরুণ বিজ্ঞানীদের কি হবে?

তারা কি অন্য কোন নতুন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবেন, নাকি আরো দশ জনের মত এক সময় বিদেশে পাড়ি জমাবেন?

আবার ধরা যাক সেনাবাহিনী অর্থ বরাদ্দ করতে রাজি হল এবং সেই অর্থ বরাদ্দ করে এমন একটি ড্রোন তৈরি করা হল যা কিনা সেনাবাহিনীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তারা উদ্ভাবকদের সাথে চুক্তি করলেন উদ্ভাবকরা যেন এই ধরনের আরো চারটি ড্রোন সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি করে দেন। এই চুক্তির মেয়াদ হবে ১ বছর এবং এই সময়ের মধ্যে উদ্ভাবকদেরকে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো চারটি ড্রোন তৈরি করে দিতে হবে।

উদ্ভাবকরা চুক্তি মোতাবেক তাদের ড্রোনগুলি তৈরি করলেন এবং সেনাবাহিনীতে সরবরাহ করলেন।

কিন্তু তারপর?

সেনাবাহিনী কি প্রতি বছর একই পরিমাণের অর্ডার দিতে পারবে? সেই মোতাবেক কোন প্রকার পরিকল্পনা যদি না থাকে, তাহলে উদ্ভাবকরা তাদের পণ্যগুলি কোথায় বিক্রি করবেন? অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কি একই পণ্য কিনতে রাজি হবে?

যে কোন নতুন পণ্য উদ্ভাবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উদ্ভাবনটিকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করানো। একটি উদ্ভাবন করেই কাজ শেষ হয়ে যায় না, বরং উদ্ভাবনটিকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর গবেষণার। এই গবেষণার জন্য আবার প্রয়োজন প্রচুর অর্থের।

অর্থের সংস্থান হলে এবং গবেষণা পরিপূর্ণভাবে করতে পারলে একটা সময় আসবে যখন উদ্ভাবনটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করার প্রয়োজন দেখা দেবে। ফলে প্রয়োজন হবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অধিক সংখ্যক একই পণ্য উৎপন্ন করার সক্ষমতা অর্জন করার।

এই সক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন বিশালাকার কারখানা, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, লোকবল, ইত্যাদি।

যেমন ধরা যাক, ড্রোনের উদ্ভাবকরা বিভিন্ন খাত থেকে টাকা যোগাড় করে গবেষণা করলেন এবং বাজারের চাহিদা মত ড্রোন তৈরি করলেন। তারা দেশে এবং বিদেশে একটি মার্কেটিং জরিপ চালালেন এবং দেখলেন দেশে এবং বিদেশের বাজারে প্রতি বছর এই ধরনের ড্রোনের চাহিদা রয়েছে প্রায় ২০০০ টি।

তারা যোগ-বিয়োগ করে বের করলেন, তারা যদি এই ব্যবসায় টিকে থাকতে চান, তাহলে তাদেরকে প্রতি বছর অন্তত ৩০০ টি ড্রোন তৈরি করতে হবে, এবং তা বিক্রি করতে হবে প্রতিটি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যে। এটি করতে পারলে সব খরচ বাদে যে টাকা উদ্ভাবকদের জন্য লাভ হিসাবে থাকবে, তা সন্তোষজনক এবং এই ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু বছরে ৩০০ টি ড্রোন তৈরি করার জন্য প্রয়োজন একটি বড় কারখানা, জমি, লোকবল এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। এর জন্য প্রয়োজন বিরাট আকারের বিনিয়োগের।

এই বিনিয়োগ তাহলে করবে কে?

উন্নত দেশগুলিতে একজন উদ্ভাবক যখন একটি নতুন পণ্য উদ্ভাবন করেন, তখন প্রাথমিক এই কাজগুলো করার জন্য বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি গবেষণা ফান্ড রয়েছে। এর মধ্যে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের মূল লক্ষ্যই থাকে এই ধরনের উদ্ভাবনে অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা। এদের অনেকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি নামে পরিচিত। এদের মূল উদ্দেশ্য হল একটি উদ্ভাবনকে বাজারজাত করার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব তাদের বিনিয়োগের টাকা উঠিয়ে নিয়ে আসা।

এই সকল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলি এই ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিতে রাজি হয় শুধু তখনই যখন তারা দেখতে পায় উদ্ভাবিত পণ্যটির বাজার সম্ভাবনা অনেক বেশি, এবং এই পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারলে তাদের বিনিয়োগের অর্থ খুব সহজেই উঠে আসবে।

কিন্তু বাংলাদেশে আপাতত এই সম্ভাবনা নেই। কারণ বাংলাদেশে সাধারণ ব্যবসার ঝুঁকি এতোটাই বেশি যে কোন বেসরকারি বিনিয়োগকারী এই অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে সাহস করবেন না। তাই বাকি থাকে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো।

কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই গবেষণা ফান্ডের অপ্রতুলতা রয়েছে। আবার গবেষণা ফান্ড হলেই তো হবে না। গবেষণা শেষ করার পর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য যে কারখানার প্রয়োজন, তা নির্মাণ করার অর্থ কে দেবে?

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো এই ঝুকিপূর্ণ বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে না, তা চোখ বন্ধ করেই বলা যায়।

তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি?

গবেষণা এবং বাজারজাতকরনের ধাপসমূহ

উপরের আলোচনার আলোকে এখন আমরা দেখব এই ধরনের গবেষণায় কোন কোন ধাপে কি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, এবং তা কিভাবে মেটানো সম্ভব। এই ধাপগুলি শুধু ড্রোনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এটি প্রযোজ্য যে কোন নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই। আমরা নীচের সারণিতে এই ধাপগুলি আলোচনা করছিঃ

পর্যায়	পর্যায়ের ধরন	মন্তব্য
প্রাথমিক পর্যায়	এই পর্যায়ে একজন উদ্ভাবক একটি নতুন পণ্য উদ্ভাবন করেন এবং তা সকলের সামনে উপস্থাপন করেন।	এই পর্যায়টি সাধারণত উদ্ভাবকরা নিজের টাকাতেই করে থাকেন। তরুণ বিজ্ঞানীদের তৈরি করা ড্রোন এখন এই পর্যায় অতিক্রম করছে। একটি পণ্য যদি সম্পূর্ণ নতুন হয়ে থাকে তাহলে এই পর্যায়ে পণ্যটির পেটেন্ট করার প্রয়োজন রয়েছে। বিদেশে এই পেটেন্ট করার খরচ অনেক বেশি। একজন উদ্ভাবক যদি দরিদ্র হন, তাহলে তার পক্ষে এই খরচ নিজে বহন করা সম্ভব নয়। ফলে একটা সময় আসবে যখন হয়তো অন্যরা তার উদ্ভাবিত পণ্য নকল করে ফেলবে। ফলে তিনি বঞ্চিত হবেন তার প্রত্যাশিত আয় থেকে।

প্রাক–মধ্যম পর্যায়	এই পর্যায়ে উদ্ভাবক কোন একটি সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অর্ডার লাভ করেন, এবং তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারেন।	সাধারণত এই পর্যায়ে গবেষণার জন্য একটি বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। উন্নত দেশগুলিতে এই আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে আসে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। আবার অনেক সময় বিভিন্ন নাম করা বেসরকারি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ফান্ড সরবরাহ করে। কারণ বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তাদের প্রয়োজন নতুন পণ্য। এছাড়াও অনেক বেসরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলোও এই পর্যায়ে এগিয়ে আসে। তবে অনুন্নত দেশগুলিতে যেহেতু বেসরকারি খাত খুব দুর্বল, সেহেতু সরকারি সহযোগিতা না থাকলে এই পর্যায়ে এসে অধিকাংশ উদ্ভাবনের অপমৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশে অধিকাংশ উদ্ভাবনের অপমৃত্যু ঘটে এই পর্যায়ে এসে।
মাধ্যমিক পর্যায়	এই পর্যায়ে উদ্ভাবক বাজারের চাহিদা জানতে পারেন এবং সেই চাহিদা অনুসারে বাণিজ্যিকভাবে পণ্য তৈরিতে খরচ কেমন হবে, সেই সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন।	দেশে এবং বিদেশে বাজারের চাহিদা জানার জন্য এই সময়ে উদ্ভাবককে প্রচুর স্থানে ভ্রমণ করতে হয়। এই ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজন অর্থের। উন্নত দেশগুলিতে উদ্ভাবকরা সাধারণত এই পর্যায়ে এসে তাদের পণ্যটি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেন। ফলে এই পণ্যটির বাজারজাত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে নেয় নতুন ক্রেতা কোম্পানিটি।
চূড়ান্ত পর্যায়	এই পর্যায়ে পণ্যটির বিভিন্ন সংস্করণ সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসে।	সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় আওতায় আনতে হলে পণ্যটির মুল্য হতে হবে কম। উৎপাদন খরচ শুধু তখনই কম হবে যখন একই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে প্রচুর পরিমাণে পণ্য তৈরি করার সামর্থ্য অর্জন করা যাবে। এই সামর্থ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজন বিরাটাকারের কারখানার যেখানে অতি অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন সম্ভব। অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন সম্ভব না হলে বিনিয়োগের টাকা দ্রুত তুলে আনার জন্য প্রতিটি পণ্যের দাম রাখতে হবে বেশি। ফলে তা বিক্রিও হবে কম।

উদ্ভাবকের সীমাবদ্ধতা

উপরের সারণিটির আলোকে এখন আমরা আলোচনা করব একটি উদ্ভাবনের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভাবকের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। নীচের সারণিতে উদ্ভাবনের প্রতিটি পর্যায়ে একজন উদ্ভাবকের বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

পর্যায়	উদ্ভাবকের সীমাবদ্ধতা
প্রাথমিক পর্যায়	এই পর্যায়ে একজন উদ্ভাবক সাধারণত নিজের টাকাতেই গবেষণা কাজটি করে থাকেন। তাই উদ্ভাবক যদি দরিদ্র হন, তাহলে তার একটি অসাধারণ আইডিয়াও জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করা যাবে না যদি তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পারেন। আবার একটি উদ্ভাবন সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কার হলে তা পেটেন্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা উদ্ভাবকদের না-ও থাকতে পারে। পেটেন্ট করতে হলে আইনজীবীদের পরামর্শের প্রয়োজন, এবং এই ধরনের পরামর্শ ব্যয়বহুল।
প্রাক-মধ্যম পর্যায়	একজন উদ্ভাবক যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি বা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত না থাকেন, তাহলে এই পর্যায়ে এসে অতিরিক্ত অর্থ যোগান দেয়া অনেক উদ্ভাবকের পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে কারা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রদান করে, সেই সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটাও প্রয়োজন। আবার শুধু জ্ঞান থাকলেই চলবে না, একটি নতুন পণ্যের যাবতীয় গুণাগুণ সুন্দরভাবে ইংরেজিতে উপস্থাপনেরও প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট না-ও হতে পারেন।মনে রাখতে হবে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলি নিয়মিতই বিভিন্ন পণ্যের অর্থায়নের অফার পাচ্ছেন। তাই আপনার পণ্যের চেয়ে অন্য আরেক জনের পণ্য যদি অধিক লাভজনক হয়, তাহলে তারা আকৃষ্ট হবেন সেই পণ্যটির বাজারজাতকরণের দিকে।
মাধ্যমিক পর্যায়	একজন উদ্ভাবকের নিজের তৈরি পণ্যের বাজার সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আবার বাজারে প্রবেশ করলেই হবে না, একই বাজারে একই ধরণের অন্য কোন পণ্য কিভাবে কাজ করছে, সেই সম্পর্কে বিষদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উদ্ভাবক যদি স্বল্প শিক্ষিত হন, তাহলে এই পর্যায়ে এসে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন শুধুমাএ বাজার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে।
চূড়ান্ত পর্যায়	এই পর্যায়ে এসে একজন উদ্ভাবককে একজন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ীর মানসিকতা নিয়ে আগাতে হবে। তাকে জানতে হবে ব্যবস্থাপনা কৌশল, মার্কেটিং কৌশল, আন্তর্জাতিক আইন, ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের যে সকল তরুণ বিজ্ঞানীরা ড্রোন তৈরি করেছেন, তারা অনেক শিক্ষিত, এবং সকলেই কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন। ফলে অনেক পরামর্শই তারা পাবেন বিনামুল্যে। কিন্তু সারা দেশে যদি উদ্ভাবন-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে তো শুধুমাত্র গুটিকয়েক উদ্ভাবনকে উৎসাহ দিয়ে কাজ হবে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যা সারা দেশে "**উদ্ভাবন-বান্ধব পরিবেশ**" বা Invention Friendly Environment সৃষ্টিতে কাজ করবে[৩]।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীর আয়োজন করছে বটে, তবে উপরে আমরা যে সকল সমস্যার কথা আলোচনা করেছি, তা সমাধানের কোন সরকারি উদ্যোগ আমাদের নজরে এখনো পড়েনি।

আমরা এখন নীচের সেকশনে দেশের এই সমস্যা সমাধানে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপরেখা আলোচনা করব।

আইএফডি'র প্রস্তাবনা

আমরা মনে করি দেশে একটি উদ্ভাবন-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যার কাজ হবে বিভিন্ন উদ্ভাবকদের তাদের উদ্ভাবিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হতে পারে Centre for Promotion of Scientific Inventions বা সংক্ষেপে CPSI । ফলে দেশে ব্যক্তিখাতের যে দুর্বলতা রয়েছে, CPSI তা পূরণ করবে এবং দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করবে যাতে নতুন পণ্যের গবেষণা এবং পরিপূর্ণতা প্রদানে ব্যক্তিখাত ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়।

[৩] Invention বা উদ্ভাবন হল সম্পূর্ণ নতুন পণ্য সৃষ্টি। আর ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত পণ্যের নতুন সংস্করণ তৈরিকে বলা হয় Innovation । বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা যে ড্রোন তৈরি করেছে, তা মূলত Innovation । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন আশীর্বাদ হতে পারে, তেমনি তা নতুন বিপদও ডেকে আনতে পারে। তাই সবার উচিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকা।

নীচে আমরা সংক্ষেপে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী ব্যাখ্যা করছি।

১. প্রথমে কোন উদ্ভাবক তার পণ্যের মডেল বা আইডিয়া নিয়ে আসলে CPSI এর অফিসাররা পণ্যটির গুণাগুণ যাচাই করবেন এবং সমাজে তা কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম কিনা, তা দেখবেন।

২. তাদের যাচাইয়ের ফলাফল যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে CPSI উদ্ভাবকের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হবে।

৩. এই চুক্তির আওতায় CPSI উদ্ভাবককে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য এবং কারিগরী পরামর্শ প্রদান করবে। পণ্যটির পেটেন্ট করার প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠানটি পেটেন্টের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

৪. কারিগরী পরামর্শ প্রদানের জন্য CPSI দেশের বিভিন্ন খাতের দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ করবে, এবং প্রয়োজনানুযায়ী তাদেরকে নিয়োগ দিয়ে উদ্ভাবককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে। পরামর্শ দেয়ার জন্য পরামর্শকরা বাজার মূল্যে ফি পাবেন।

৫. উদ্ভাবক যখন তার পণ্যটির উন্নয়ন ঘটাবেন, তখন CPSI বিভিন্ন রোড শো এর আয়োজন করবে এবং চেষ্টা করবে পণ্যটির দীর্ঘমেয়াদী বাজারজাতকরণে দেশের কিংবা বিদেশের কোন বিনিয়োগকারী পাওয়া যায় কি না।

৬. যদি বিনিয়োগকারী পাওয়া যায়, তাহলে বিক্রয় মূল্যের একটি অংশ পাবেন উদ্ভাবক, এবং আরেকটি অংশ পাবে CPSI । ফলে CPSI এতদিন যে বিনিয়োগ করেছে এই পণ্যটির বাজারজাতকরণে, তা লাভসহ উঠে আসবে।

৭. অন্যদিকে কোন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে CPSI যৌথভাবেও কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে উদ্ভাবক, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং CPSI এর মধ্যে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হবে যার আওতায় ব্যবসাটি পরিচালিত হবে।

৮. CPSI এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়। প্রতি বছর বাজেটে এই খাতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকতে হবে। তবে লক্ষ্য থাকবে যত দ্রুত সম্ভব এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে স্বাবলম্বী হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে সরকারের কোন বরাদ্দের প্রয়োজন না হয়।

এই ধরনের একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য খুব বড় কোন অফিসের প্রয়োজন নেই। গুটিকয়েক কর্মকর্তাদের দিয়েই এর কার্যক্রম শুরু করা যায়। তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

শেষ কথা

একটি জাতি কতটুকু দ্রুত গতিতে উন্নয়ন সাধন করবে, তার অনেকাংশই নির্ভর করে জাতিটি তার উদ্ভাবকদের কতটুকু মূল্যায়ন করছে। এই মূল্যায়ন যদি কম হয়, তাহলে নতুন আবিষ্কারের নেশায় কেউ সময় কাটাবে না। ফলে যাদের উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে তারা এক সময় ব্যর্থ হয়ে মনোযোগ দিবেন কিভাবে চাকরি কিংবা ব্যবসা করে সংসার চালানো যায়। আর যাদের সামর্থ্য আছে, তারা চলে যাবেন উন্নত দেশগুলিতে যেখানে উদ্ভাবনের মূল্য রয়েছে।

ফলে এক সময় আসবে যখন তাদের উদ্ভাবিত পণ্যের কথা আমরা জানতে পারব বিভিন্ন মাধ্যমে। কিন্তু সেই সংবাদে আমাদের আত্মতৃপ্তি পাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। তাদের সেই উদ্ভাবিত পণ্যের সকল লাভ তখন পাবে অন্য দেশের কোম্পানিগুলো।

CPSI এর কার্যক্রম লাভজনক প্রমাণিত হলে এক সময় আসবে যখন এই নতুন পণ্যগুলির বাজারজাতকরণে ব্যক্তিখাতও আকৃষ্ট হবে। ফলে তারাও একটি উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম এবং পরবর্তী বাজারজাতকরণে শুরু থেকেই যুক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করবেন।

ফলে গবেষণা খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ বাড়বে এবং সারা দেশেই একটি উদ্ভাবন-বান্ধব পরিবেশের সৃষ্টি হবে যেখানে একজন উদ্ভাবককে, তিনি ধনী কিংবা দরিদ্র হন না কেন, তার উদ্ভাবিত পণ্যের বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হবে না।

তার কাজ হবে শুধু নিবিড় মনে গবেষণা করে সময় সময় তাক লাগানো উদ্ভাবন করা। বাকি কাজ করবে অন্যরা।

তথ্যসুত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, দি ডেইলি স্টার, দৈনিক আমাদের সময় এবং দি নিউ এজ।

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই ঢাকা'র সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) ইন্টার্ন হিসাবে গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান ইউএসএ'তে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলেও লেখক হিসাবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক ***'যায়যায়দিন'*** পত্রিকার মাধ্যমে। ২০০৪–২০০৬ সময়কালে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার একাধিক রচনা সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, গবেষণা করেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

Ideas for Development (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মুল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বত্রই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপুর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাএ আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

[Keyword for Websearch: IFD Special Article 7, Drone, Bangladesh's Drone Success and IFD's Recommendations]